অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। আকাশের তারা যতদিন ততদিন ।।

দিনক্ষন পুরোপুরি মনে নেই। কোন এক মেলায় বা অনুষ্ঠানে সেই বারউডেই বছর কয়েক আগে। ইতিউতি ঘুরছি। হঠাৎ একজন বয়স্ক শ্রদ্ধাভাজন আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। সালাম দিলেন। লজ্জা পেয়ে গেলাম। মুরুব্বী মানুষ আমার আগেই সালাম দিয়ে ফেললেন। শুধালেন - আপনি কাইউম পারভেজ সাহেব ? জ্বি। আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। আমি নিয়মিত আপনার লেখা পড়ি পত্রপত্রিকায় ইন্টারনেটে। আপনার লেখার একজন ভক্ত বলতে পারেন। এবারে রীতিমত প্রমাদ গুনতে শুরু করলাম। ভদ্রলোক বলেন কি? অন্য কারো সাথে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন নাতো? সত্যি বলতে মাঝে মধ্যে যা লিখি তা কোন লেখা হয় কিনা পাঠকরাই বলতে পারবেন। তাঁরা উৎসাহ দেন তাই লিখি। লেখাপড়াও খুব একটা নেই। সামান্য যেটুকু লেখাপড়া তাও আবার কৃষিবিদ্যা। সেটাও যে ঠিকমত শিখেছি জেনেছি তাও নয়। ছত্রিশ বছর ধরে কৃষি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি, পেট চালাচ্ছি অথচ আজ অবদি জানতে পারিনি বিশ্বজুড়ে কৃষির এতো অগ্রগতি এতো খাবার উদ্বৃত্ত থাকার পরও প্রতিদিন কেন কয়েক কোটি মানুষ অনাহারে অর্ধাহারে থাকে? কেন সামান্য একটু খাবারের অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার আগে তার নিজস্ব ভাষায় "মা" বলে ডাকার শক্তিটাও হারিয়ে ফেলে?

আসলেই কিছু লিখতে পারিনা। অনেকটা গায়ের জোরে ব্যাড়া ভেঙ্গে ক্ষেতে ঢুকে যাবার মত ব্যপার। হতচ্ছাড়া মনটাকে নিয়ে যত সমস্যা। সেই যে তরুণ বন্দোপাধ্যায়ের গানের মতন - "আমার মনকে নিয়েই আমার যত ভাবনা"। এ হতচ্ছাড়া মন কখন যে কি ভাবে কিসে হাসে কিসে কাঁদে কিসে স্বপ্ন দেখে কিসে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে নিজেই জানে না। ওদিকে কিছু করতেও পারে না। কেবল পারে আমাকে গুঁতোতে। লেখো না - কিছু একটা লেখো, দেখবে ভালো লাগবে। ওর কাছে যখন হেরে যাই তখনই ছাইপাঁশ কিছু লিখি। পত্রিকা বা নেটের মালিকদের কাছে পাঠাই। যাঁদের পছন্দ হয় ছাপেন নইলে গালমন্দ দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

তো আমি হলাম গিয়ে সেই পদের লেখক। যত না পদ তার'চে বেশী "আপদ"। এই আপদ নিয়ে একটা মজার গল্প শুনেছিলাম। সেটাই না হয় আগে বলি। ড. অন্নদা শংকর রায় তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সম্ভবতঃ পিএইচডির মৌখিক পরীক্ষা দিচ্ছেন। সে আমলে তাই হোত। তো সেই, ব্রিটিশ রাজত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান থেকে উচ্চপদাসীনরা সবাই সাদা চামড়ার। এমন কি বাংলা বিভাগেরও। তেমনি কয়েকজন সাদা চামড়ার শিক্ষকসহ অন্যান্য বাঙালি শিক্ষকরা ড. অন্নদা শংকরের মৌখিক পরীক্ষা নিচ্ছেন। তো এক সাদা শিক্ষক তাঁকে প্রশ্ন করলেন - আচা রে, (আচ্ছা রায়), বলোটো (বলোতো) হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন "আপাড" (আপদ) এ্যান্ড "বিপ্যাড" (বিপদ)। শংকর তো প্রথমে রীতিমত ভ্যাবাচ্যাকা খেলেন। সামলে নিয়ে বললেন - কি বলবো বল দুঃখের কথা - কি ভাবেই বা বলি। ধর একটা নৌকোয় করে আমি তুমি যাচ্ছি। সন্ধ্যে পেরিয়ে রাতও ঘনিয়ে এসেছে। এরই মধ্যে উঠলো প্রচন্ড ঝড়। নৌকো দুলছে। স্রোত আছড়ে পড়ছে। আস-পাশে কেউ নেই। জানিনা বাঁচবো কিনা।

এ পরিস্থিতিটাকেই বলা যায় "বিপদ"। আর এই যে অবাঙালী হয়ে একজন বাঙালীর বাংলা বিষয়ক পরীক্ষা নিচ্ছো - এটাই "আপদ"।

আপদ আর কাকে বলে। শুরু করেছিলাম কোথায় আর কোথায় চলে এসেছি। যাকগে, বারউডে দেখা সেই শ্রদ্ধাভাজনের কথার উত্তরে বললাম - জানিনা আসলেই আমার লেখা আপনার ভালো লাগে কিনা। যদি কখনো অপছন্দ হয় বলবেন কেন অপছন্দ। আমি শুধরে নেবো। তাহলে হয়তো একদিন সত্যি সত্যিই লিখতে পারবো। যাহোক - আলাপে গল্পে অনেকদুর এগোলাম আমরা। আর তখনই জানলাম তাঁর নাম সায়েফ আব্দুল হক। শুধালাম আপনি কি রিমা সায়েফের ----- বললেন বাবা। বুঝলাম তিনি প্রতীতির চেনা মুখ চেনা শিল্পী রিমা সায়েফের বাবা। দারুণ আগ্রহ তাঁর বাংলা সাহিত্যে। অবসরপ্রাপ্ত ডিপ্লোম্যাট অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চাকরী করেছেন বিভিন্ন দূতাবাসে। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতায় ঠাঁসা তাঁর বর্ণাঢ্য দূতিয়ালী জীবন। সেই সব অভিজ্ঞতা, স্মৃতি যেন হারিয়ে না যায়। যেন নাতি নাতনিরা জানতে পারে। যেন জানতে পারে আমাদের দেশের পরবর্তী কর্নধাররা। তাই সেসব অজানা অল্প-স্বল্প-গল্প লিখে রেখেছেন কয়েকটি বইতে। না - তাঁর লেখক পরিচিতি লাভের কোন বাসনা নেই। তাই ক'জনে তাঁর বই পড়লো তা নিয়ে কোন ভাবনাও নেই তাঁর। এরই মধ্যে মাইকে আমার ডাক পড়লো - আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

দিন চার পাঁচ পর একদিন মেইলে একটা প্যাকেট। খুলে দেখি ------ সায়েফ আব্দুল হক তাঁর লেখা দুটি বই পাঠিয়েছেন। ছোট্ট একটি চিঠি। দুটো বইয়ের একটি হোল "কূটনীতির ইতিকথা" আর অপরটি "মানুষ ও ভূত"। দুটো বই-ই জীবন প্রকাশনের প্রকাশ। দুরকমের স্বাদ আছে বই দুটিতে যা নাম গুলো দেখেই উপলব্ধি করা যায়। "কূটনীতির ইতিকথা" বইটিতে সর্বমোট বাইশটি ছোট ছোট মজার গল্প আছে। প্রথম গল্পটি "মুক্তিযুদ্ধের এক সৈনিকের সাথে প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ"। শেষ গল্পটিই হোল "কূটনীতির ইতিকথা"। এ গল্পেই ১৩৩ পাতায় লিখেছেন " ----- সপ্তাহ দুয়েক পরের প্রসঙ্গ। এক রাতে ক্যাসিনো থেকে ফেরার পথে মিউজিক নিয়ে আলোচনাকালে জাকির সাহেবের মনে পড়ে যায় আরব জগতের কোকিলকণ্ঠী সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী উম্মে কুলসুমের কথা। পাকিস্তানী আমলে তিনি যখন কোয়েতে ছিলেন তখন সেখানেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। পাকিস্তানের জাতীয় দিবসের উৎসবে তিনি সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আসেন পাকিস্তান এ্যামবেসীতে। সে পরিচয়টা আন্তরিকতায় পরিপূর্ন হয়ে উঠে। তাঁর কণ্ঠে আল্লামা ইকবালের কবিতা সুর হয়ে মধু বর্ষন করেছিলো শ্রোতাদের কানে। জাকির সাহেব তাঁকে চারটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড উপহার দিয়েছিলেন। মনে পড়তেই তিনি প্রটোকল অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন

- ম্যাডাম উম্মে কুলসুম কোথায় থাকেন?
- প্রটোকল অফিসার বিস্মিত কণ্ঠে বলেন - আপনি তাঁকে জানেন নাকি?
- জাকির সাহেব - কোন এক সময়ে জানতাম।
- প্রটোকল অফিসার - বলেন কি! আমি নিজেইতো তার পূজারী । তার জন্য আমার জান হাজির। যাবেন নাকি তাঁর কাছে একবার?
- জাকির সাহেব - সেটা হবে আমার কায়রো জীবনের একটা বিশেষ দিন।

জাকির সাহেব ভেবেছিলেন এতদিন পর ভদ্রমহিলা কি আর তাঁকে মনে রেখেছেন কিন্তু ঘরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে যে আনন্দ উচ্ছ্বাসে উম্মে কুলসুম তাঁকে বুকে টেনে নিলেন তা দেখে প্রটোকল অফিসার অবাক না হয়ে পারেননি। যেন হারানো ছোট ভাইকে বহুদিন পরে ফিরে পেয়ে বড় বোনের ব্যাকুল উন্মাদনা। এত বয়সে কি অদ্ভূত সুন্দরী এ মহিলা। শুধু শরীরে ও গানে সুন্দর নয় হৃদয়টাও বড় বেশি সুন্দর তাঁর। ----

- স্বহস্তে আঙ্গুরের রস ভরা গ্লাস আর মিষ্টি নিয়ে পাশে এসে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো রবীন্দ্র সঙ্গীত। কারো কণ্ঠে কোন কথা নেই। সারা ঘরটাই যেন সঙ্গীতময় হয়ে উঠলো। এ যেন কায়রো নয়। শান্তি নিকেতন। শান্ত নিলয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের নতুন অভিষেক। রেকর্ড বন্ধ হতেই ভক্তদের অবাক করে দিয়ে সুরের তরঙ্গে ভেসে গেলেন উম্মে কুলসুম নিজে। প্রত্যেকটা গান আবার নিজে গেয়ে শোনালেন। ---------- ম্যাডাম উম্মে কুলসুম তাঁকে লক্ষ্য করে বলে বসলেন - পত্রিকায় দেখেছি বাংলাদেশ মিশন নাকি মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় লিপ্ত? হাশিশের একটা কনসাইনমেন্ট নাকি ইদানিং ধরা পড়েছে?"
বিদেশে আমাদের মিশনগুলিতে যে কি সব কান্ড কারখানা হয় সেটা দেশের মানুষকে জানিয়ে দেবার সৎ সাহস দেখিয়েছেন সায়েফ তাঁর এ বইটিতে। তাইতো এর মুখবন্ধে লিখেছেন - "বাহির জগতে পাতা ঝরার শব্দটিও প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠে দুর-দুরান্তে কিন্তু ভেতর জগতের তোলপাড়ের খবর কেউ জানে না। কূটনীতি জগতের ভিতর ও বাইরে থাকাকালীন সময়ে দেখেছি অফিস আদালতের ধূলোবালি আর ইট-পাটকেলও অনেক জন্ম-মৃত্যুর স্বাক্ষর বহন করে। এখানেও জন্ম মৃত্যুর পরিক্রম ঘটে। ------ এখানে বিদেহী আত্মার কান্না গুমরে মরে আর পরিত্রাণের পথ খোঁজে"।

"মানুষ ও ভূত" এ বইটিতে মানুষ পর্বে আছে সাতটি এবং ভূত পর্বে আছে সাতটি গল্প। মজাদার সব গল্প। দৈনিক আজাদের মুকুলের মহফিল আর সংবাদের খেলাঘরের পাতায় তাঁর লেখার জগৎ শুরু। প্রথম কাব্যগ্রন্থ "চেনা অচেনার চোখের জলে" এবং দ্বিতীয়টি "শালিক পাখীর চোখে জল"। সায়েফ আব্দুল হক সিডনিতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। বয়সের ভারে একটু দুর্বল হলেও লেখা এবং পড়ার নেশায় এখনো বুঁদ। তাঁর সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এবারে আরেকটি বইয়ের গল্প। হ্যামন্ডভিলের হেলাল মোর্শেদী একদিন বললেন - আপনি যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত ছিলেন এবং সেটা নিয়ে লেখালেখিও করেন তাই অতি সম্প্রতি প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা একজন মুক্তিযোদ্ধার একটা বই আপনাকে পড়তে দেবো। আমি সানন্দে আমার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। সপ্তাহ দুই আগে হেলাল মোর্শেদী আমার বাসায় আমার জন্য এ মূল্যবান উপহারটি রেখে গেছেন - "আপন আয়নায় একাত্তর"। অতি সম্প্রতি বইটির বিজ্ঞাপন আমাদের ইন্টারনেট গুলোতে পাঠক নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা সফিকউল্লাহ-র মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি সম্বৃদ্ধ যুদ্ধ দিনের গাঁথা - "আপন আয়নায় একাত্তর"। এতো তথ্যবহুল এ বই যে নিজেরই মনে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কত কিছুই আমার অজানা। বইটি পড়েছি আর আমাকে আমি যেন বারবার ফিরে পেয়েছি সেই একাত্তরের দিনগুলিতে। এই মার্চে তথ্য সম্বৃদ্ধ এ বইখানি পড়ে মনে হয়েছে আপন আয়নায় একাত্তর। আমার নিজের আর্শিতে। আমি হেলাল মোর্শেদী এবং তাঁর স্ত্রী কানিজ ফাতেমা মিতুর কাছে কৃতজ্ঞ।

সম্ভবত ১৯৯৪-৯৫ তে কানিজ ফাতেমা মিতুর সাথে আমার প্রথম পরিচয়। আমি তখন বারউডে আমাদের বৈশাখী মেলার অনুষ্ঠানের মহড়া নিয়ে ব্যস্ত। বন্ধু মহিউদ্দীন শাহীন মিতুর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন ইনি খুব ভালো গীটার বাজান। যদি মনে করেন তবে আমাদের অনুষ্ঠানেও বাজাতে পারবেন। তক্ষুনি তাঁর গীটারবাদন শুনলাম। এবং মুগ্ধ হয়ে অনুরোধ করলাম আমাদের সে বারের অনুষ্ঠানে বাজাতে। দারুণ বাজিয়ে ছিলেন। তো সেই কানিজ ফাতেমা মিতু-ই হলেন "আপন আয়নায় একাত্তর" এর লেখক বীর মুক্তিযোদ্ধা সফিকউল্লাহ-র গর্বিত কন্যা। মিতু তাঁর দু সন্তানের মধ্যে কিভাবে বাংলা ভাষা সংস্কৃতি স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের বীজ সার্থকভাবে বপন করে দিয়েছেন সেটা যাঁরা এই

প্রতিশ্রুতবদ্ধ পরিবারটিকে জানেন তাঁরা আমারচে' ভালো বলতে পারবেন। আমি শুধু মিতুকে বলবো যোগ্য বাবার যোগ্য মেয়ে।

সে কথা লেখক সফিকউল্লাহও লিখেছেন তাঁর বইয়ের শুরুতে। " বছরখানেক আগে অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত আমার এগারো বছর বয়সের নাতি রাফিদ তার স্কুলে পারিবারিক ইতিহাস সংক্রান্ত একটি এ্যাসাইনমেন্ট লিখতে গিয়ে তার মায়ের কাছে জানতে পারে তার নানাভাই সফিকউল্লাহ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। নানা ভাইয়ের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের বিষয়টি রাফিদকে এতই উদ্বেলিত করে যে, সে টেলিফোনে মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশ গ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিষয়টি জেনে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করে তার স্কুল এ্যাসাইনমেন্টে জমা দেয়। তার এই পারিবারিক ইতিহাস সংক্রান্ত প্রজেক্টটি শিক্ষক কর্তৃক দারুণভাবে প্রশংসিত হয়। রাফিদ এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে আমার মুক্তিযুদ্ধে যোগদান এবং যুদ্ধক্ষেত্রের কর্মকান্ড সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে জানানোর জন্য আমাকে অনুরোধ করে। বস্তুত রাফিদের এই আগ্রহ, তার মা কানিজ ফাতেমা ও বাবা হেলাল মোর্শেদীর উৎসাহ এবং ছেলে ডা. ফরহাদের অনুপ্রেরণা আমাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ে লিখতে উদ্বুদ্ধ করে।"

"আপন আয়নায় একাত্তর" ২৯৬ পৃষ্ঠার এ বইটি প্রকাশ করেছেন আগামী প্রকাশনী। দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ করেছেন আবুল হোসেন খোকন। লেখক বইটিতে শুরু থেকেই চেষ্টা করেছেন তাঁর নিজের দেখা নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরতে। এ নয় মাসের প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের যুদ্ধ - কখনো শত্রুর সাথে, কখনো সময়ের সাথে আবার কখনো নিজের সাথে। যুদ্ধ তাঁর স্বপ্নের সাথে, আশার সাথে হতাশার সাথে ভুল ধ্যান ধারনায় সহযোদ্ধাদের সাথে। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রচুর ছবি সংযোজন করেছেন। জুড়ে দিয়েছেন অনেক দুস্প্রাপ্য দলিল। বর্নণাগুলো একেবারেই সাদামাটা যেন পাঠকের সামনে বসেই কথা বলছেন। কখনো সেটা যেন সরাসরি রনাঙ্গন থেকেই। যেমন লিখেছেন ১৭৯ পাতায় - ------ পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মধ্যরাতের পরেই খায়রুল আলম তার উপর ন্যাস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের অপারেশন স্থল চিলমারী ও উলিপুরের মধ্যস্থিত রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে চিলমারীতে পাক-আর্মির শক্তি বৃদ্ধির পথ বন্ধের জন্য রওনা হয়ে যান। আমি মাহবুব এলাহী রঞ্জুকে সম্পূর্ন প্রস্তুত রেখে ভোর রাতে রেজাউল করিম রাঙ্গা ও কিশোর মুক্তিযোদ্ধা তারাকে (১৩/১৪ বছর) নিয়ে খায়রুল আলমের বিভিন্ন অবস্থান ও কার্যক্রম তদারক করতে থাকি। ঘুঘুমারীর চর থেকে রওনা দেয়ার সময় তারার বয়স খুব কম হওয়ায় তাকে এই অপারেশনে না নিয়ে আমরা যখন নৌকায় উঠছিলাম তখন সে অপারেশনে যাওয়ার জন্য রীতিমত কান্না জুড়ে দেয়। এরপর তাকে ফেলে যখন আমরা নৌকা ছেড়ে দেই তখন সে নৌকায় ওঠার জন্য ব্রক্ষ্মপুত্র নদে লাফিয়ে পড়ে। তখন তাকে নৌকায় তুলে নিতে বাধ্য হই। তরুণ এই মুক্তিযোদ্ধার সাহস ও দেশপ্রেম দেখে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল আরো বৃদ্ধি পায়"।

এমন চমৎকার সব তথ্যে পূর্ন বইটি। মুক্তিযুদ্ধের আগে পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন কোহাটে। একাত্তরের জানুয়ারীতে দেশে এসে কর্মস্থলে ফিরে না গিয়ে সরাসরি ওদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে নেমে পড়লেন। প্রিয় মাতৃভুমিকে শত্রুমুক্ত করার পর বিসিএস দিয়ে পুলিশ ক্যাডার সার্ভিসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ন পদে আসীন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কমিটেড এই মানুষটি অবশেষে বর্তমান জোট সরকারের রোষানলে পড়লেন। ২০০২ এর শুরুতেই অন্যদের সঙ্গে বাধ্যতামূলক অবসর নিতে "বাধ্য" হলেন।
লেখক সফিকউল্লাহর-ও বোধ করি বিখ্যাত প্রখ্যাত লেখক হবার বাসনা নেই। একটা কষ্টের তাড়না থেকেই প্রতিদিন তিনি যে আয়নায় মুখ দেখেন সে আয়না আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর বই তাঁর নাতি

নাতনিদের জন্য আগামী দিনে যাদের হাতে বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব তাদের হাতেই দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন মাত্র। তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধু লেখক সাংবাদিক হারুন হাবীব যথার্থই বলেছেন - " এ ধরণের উদ্যোগ জাতীয় ইতিহাসের সচেতন বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করতে, নতুন প্রজন্মকে সত্য ইতিহাস উপলব্ধিতে সহায়তা করবে। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জঙ্গি মৌলবাদের বিরুদ্ধে জাতি আজ যে নতুন এক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছে এ বই সে উদ্যোগকে বেগবান করবে বলে আমার বিশ্বাস।"

আমার ও সেই বিশ্বাস - আকাশের তারা যতদিন, ততদিন।